ধর্মবাজদের দখলে পৃথিবী

ত্রিভুজের তিনটি কোণের পরিমাপ হলো একশ' আশি ডিগ্রি। এ পরম সত্যটি নিয়ে গত দু'হাজার বছরে মানব প্রজাতি কোনো বিতর্কে নামেনি। একই সময়কালে পৃথিবীতে অনেক ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে। নতুন ধর্ম পূর্ব ধর্মকে হটিয়ে নিজ স্থান করে নিতে চেয়েছে। ফলে বেঁধেছে দ্বন্দ্ব। প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে মানব প্রজাতির অগণিত সদস্যকে। ভূগোলকে রাজ্য দখলে যত মানুষ মরেছে তার সহস্র গুণ মরেছে ধর্মবিরোধে। অথচ ধর্মের কেন্দ্রে স্থান দেয়া 'সৃষ্টিকর্তা' বিষয়ে মানবপ্রজাতি মোটেই কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি একুশ শতকেও। ভারতের বৈদিক ধর্মে যেমন রয়েছে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব, আরবের সেমেটিক ধর্মে তেমনি রয়েছে এক মহা পরাক্রমশালী 'সৃষ্টিকর্তা' আবার আমাদের নিরীহ সাঁওতালদের রয়েছে এক শান্ত নরম 'সৃষ্টিকর্তা'। যার নাম হলো 'ঠাকুর জিউ', যিনি মানুষ ও মহাবিশ্ব তৈরি করেছেন। 'সৃষ্টিকর্তা'কে কেন্দ্র করে ধর্মের বিকাশ ঘটলেও সৃষ্টিকর্তাবিহীন ধর্মও পৃথিবীতে রয়েছে এবং ধর্মের অনুসারীর সংখ্যাই বর্তমান পৃথিবীতে বেশি। ধর্মটি হলো বৌদ্ধ ধর্ম। ধর্মতত্ত্ব জানা নেই। তবে আমরা নিশ্চিত পৃথিবীতে মানুষ কয়েকশ' সৃষ্টিকর্তাকে মেনে চলেছে। মতান্তরে, সকল সৃষ্টিকর্তাই মানুষের কল্যাণের জন্য ধর্ম তৈরি করেছেন কিন্তু ধর্ম এক পর্যায়ে ধুরন্ধর স্বার্থবাজদের মন্ত্র হয়ে উঠেছে বরাবরই। যারা মানব প্রজাতিকে করে তুলেছে বিপন্ন। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি প্রমুখ ধর্মপ্রচারকগণ হতে শুরু করে আমাদের লালন সাঁই সকলেই মানুষকে শান্তির ছায়ায় এনেছেন। আবার মওদুদী, নিজামীরা ধর্মের নামে হত্যা করে লাখ লাখ মানুষ, আজকের বুশ-ব্লেয়াররা ধর্মযুদ্ধ বাঁধিয়ে চুটিয়ে বাণিজ্য করছেন। একই ধর্ম শতভুক্তিতে বিভক্ত হয়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিচ্ছে। পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নির দাঙ্গা বা বাংলাদেশের কাদিয়ানি মসজিদ ভাঙা একসূত্রে বাঁধা। এভাবে ধর্মবাজরা পৃথিবী জুড়ে যে তান্ডবনৃত্য শুরু করে দিয়েছে তা থেকে পরিত্রাণের পথ কোথায়?

আনিস উল হক
আইনজীবী সমিতি, নীলফামারী

সাপ্তাহিক ২০০০ ঈদ সংখ্যা ২০০৪

সাপ্তাহিক ২০০০-এর নিয়মিত পাঠক হিসেবে চিঠি লিখছি। ৭০-৮০ দশকে সাপ্তাহিক বিচিত্রার নিয়মিত পাঠক ছিলাম। এখন শাহাদত চৌধুরী সম্পাদিত সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠক।

আমি এবার সাপ্তাহিক ২০০০ ঈদ সংখ্যা '০৪ সংখ্যার ওপর কিছু মতামত প্রকাশ করছি। এবার রোজা ও পূজা এক সঙ্গে হওয়ায় কোলকাতার পূজা সংখ্যা সাময়িকীগুলো না কিনে এই দেশের ঈদ সংখ্যা ম্যাগাজিন কিনেছি। কারণ, বাজেট শট অথচ ছাত্রজীবনে পূজা সংখ্যা উল্টোরথ, শারদীয় ঘরোয়া, সিনেমা জগৎ, পূজাসংখ্যা দেশ কেনা ও পড়ার জন্য পাগল ছিলাম। এখন আর ভালো লাগে না। অন্য কোনো কারণে নয়, শুধু দেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা।

আমার পঞ্চাশোর্ধ বয়সে গল্প-উপন্যাস পড়া ছেড়েই দিয়েছি। কিন্তু এবার সাপ্তাহিক ২০০০ ঈদ সংখ্যায় ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেনের লেখা উপন্যাস 'একটি রূপোলি নদী' পড়েছি। সত্যি অভিভূত হয়েছি। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি-পাহাড়ি সংঘাতের পটভূমিতে লেখা উপন্যাসটি পড়ে আমার মন আপ্লুত হয়েছিল, চোখে জল এসে গিয়েছিল। একটি চমৎকার মানবিক বিপর্যয়ের দলিল হিসেবে উপন্যাসটি সবার কাছে সমাদৃত হবে। ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেনকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

মূর্তাজা বশীরের আত্মচরিতটিও ভালো লেগেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে মূর্তাজা বশীর স্যারকে অনেকবার দেখেছি কৌতূহলি মন নিয়ে। চারুকলার শিক্ষক কিংবা শিল্পী হিসেবে নয়- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর পুত্র হিসেবে।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের বিমান ভ্রমণ বিষয়ক রচনাটি চমৎকার। মাকিদ হায়দারের 'স্মৃতি '৭১ মার্কটালী' স্মৃতিচারণ বিষয়ক রচনাটিও চমৎকার। পাঠকদের '৭১ সালের পাবনার একটি মফঃস্বল শহরে নিয়ে যাবে।

লোক সংগীত সম্রাট আব্বাসউদ্দিনের কন্যা প্রবীণ সংগীত শিল্পী ফেরদৌসী রহমানের আত্মচরিতটিও ভালো লেগেছে। আগামীতে সাপ্তাহিক ২০০০-এ আব্বাসউদ্দিনের জ্যেষ্ঠপুত্র বিচারপতি (অব.) মোস্তফা কামালের আত্মচরিত তথা স্মৃতিচারণ বিষয়ক রচনা পড়তে চাই।

নবীদুর রহমান সিকদার
দোহাজারী, চন্দনাইশ উপজেলা, দক্ষিণ চট্টগ্রাম

ক্ষুদ্র ঋণের নামে মহাজনি ব্যবসা

দারিদ্র্য বিমোচনের নামে সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণ দিচ্ছে, কিভাবে দিচ্ছে এবং শতকরা বার্ষিক কত টাকা সুদে নিচ্ছে? আমি এখানে এমন একটি সংস্থার কিছু কার্যাবলী তুলে ধরব। ঢাকা শহরের মিরপুরে ১২/ডি, ৪/৩৬ শহীদবাগ, এখানে স্বপ্ন নীড় নামে একটি সংস্থা। সুন্দর নাম, তারচেয়ে আরও সুন্দর একটি স্লোগান লেখা রয়েছে তাদের তৈরি কাগজপত্রে 'আর্থ-সামাজিক ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি'।

মিরপুরের হাজার হাজার দরিদ্র ও অশিক্ষিত বস্তিবাসী তাদের সদস্য। যখন তারা কোনো মানুষকে সদস্য বানানোর জন্য যায় তখন তাদের মুখে থাকে শুধু নীতিকথার ফুলঝুরি আর মিষ্টি মিষ্টি হাসি। আর সদস্য বানানোর পর দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। তাদের কথা সদস্য হলে প্রতিদিন ৫-৫০ টাকা চাঁদা দিতে পারবেন। সদস্যের যত টাকা জমা হবে তার দ্বিগুণ ঋণ পাবেন। সদস্যরা তাদের টাকা বার্ষিক ১২% হারে লাভ পাবে, আর ঋণ নিলে বার্ষিক ১৫% লাভ দিতে হবে। ঋণ নিতে গিয়ে দেখা গেল কোনো সদস্য প্রতিদিন ১০ টাকা জমা দিলে ৫০০০ টাকা জমা হতে প্রায় দেড় বছর সময় লাগে, তখন সে ১০,০০০ টাকা ঋণ পায়। যে দিন ঋণ নেবে তার পরের সপ্তাহ থেকেই কিস্তি হিসেবে টাকা জমা দিতে হয়। সাত মাসে ১১,৫০০ টাকা দিতে হয়, ১৫০০ টাকা সুদ, অর্থাৎ পুরো টাকা ঋণগ্রহিতা গড়ে তিন মাসও কাজে লাগাতে পারছে না তাহলে কি ভাবে ১৫% সুদ হয়, সুদের হার ৬০% ছাড়িয়ে যায়। সংস্থা কর্তৃপক্ষ এতই চালাক যে কোনো সদস্যদের তারা এই চালাকি বুঝতে দেয় না। অসহায় মানুষকে তারা বিভিন্ন রকম ভয় দেখানোর জন্য ৫০ টাকার স্ট্যাম্পে বন্ড সই নিয়ে রাখে এবং

প্রশ্নবিদ্ধ বিচার ব্যবস্থা

এ বছরের মাঝামাঝিতে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে অপসারিত হন সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি। সম্প্রতি জনৈক সদ্য নিয়োগ পাওয়া বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে মার্কশিট জাল করার। তিনিও বর্তমানে অপসারিত আছেন। এর মধ্যে পাবলিক নুইসেন্সের কথাও পত্রিকায় বের হয়েছে। সেদিন একটি বাংলাদেশী স্যাটেলাইট চ্যানেলে টকশো দেখছিলাম। সেখানে এসেছিলেন দু'জন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ। একজন হলেন সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ এবং আরেকজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. জহির। তাঁরা দু'জনই বেশ খোলামেলা আলোচনা করলেন। ড. জহির বললেন আইন পেশায় যাঁরা আসেন তাদের অধিকাংশই ছাত্রজীবনে খুব একটা ভালো ছাত্র ছিলেন না। রসিকতা করে তিনি বলেন যারা নাই কোন গতি সে করে ওকালতি। ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন বলেন, 'সম্প্রতি বিচারক হিসেবে যারা নিয়োগ পেয়েছেন তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন তাদের শিক্ষা জীবনের কোনো না কোনো সময় থার্ড ডিভিশন নিয়ে পাস করেছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছেন যারা ডিগ্রি পরীক্ষায় ফেল করে কিংবা রেফার্ড বা সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছেন।' আমি অবাক হয়ে গেলাম আজকাল যেখানে সাধারণ চাকরিতেই তৃতীয় শ্রেণীতে পাস করাদের নেয়া হয় না, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আগেই জানিয়ে দেয়া হয় কর্মক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণী গ্রহণযোগ্য নয়, সেখানে সুপ্রিম কোর্টের মতো সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগের বেলায় কিভাবে তৃতীয় শ্রেণীতে পাস করা ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া হয়! এসব বিচারকের জন্য গোটা বিচার ব্যবস্থা আজ প্রশ্নবিদ্ধ।

এস এম নওশের
বাংলাবাজার, ঢাকা
nowsheer@dhaka.net

বলে, যদি সময় মত ঋণের টাকা পরিশোধ না কর তাহলে মালামাল ক্রোক করে নিয়ে যাব অথবা মামলা দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দেব ইত্যাদি। সদস্যদের কাছে শুধু একটি পাস বই ছাড়া আর কোনো ডকুমেন্ট থাকে না। মাঠকর্মীরা এসে চাঁদা নিয়ে যায় এবং মাঝে মাঝে বই নিয়ে যায়, বলে অডিট করবে। দেখা যায় অনেক সময় ৫০০-৭০০ টাকাও জমা হয় না, ঠিক মতো বই সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেয় না। পুরানো বই পরিবর্তন করে নতুন বই দিয়ে দেওয়া হয় এবং এখানেও হিসাবের গরমিল করে। আর যদি কোনো সদস্য তার সদস্যপদ প্রত্যাহার করে হিসাব-নিকাশ বুঝে নিতে চায়, সে ক্ষেত্রে তাকে লাভের কোনো অংশ দেওয়া হয় না বলে আপনার ইচ্ছায় সদস্যপদ প্রত্যাহার হবে না। তারপর তার জমাকৃত টাকা পেতে সময় লাগে ৬ মাস থেকে ১ বছর। সদস্য বেশি দুর্বল হলে তার জমা টাকাও পায় না। এই হলো তাদের ১২% ও ১৫%-এর সারমর্ম। এভাবে নতুন নতুন এ ধরনের মহাজনি ব্যবসায় লিপ্ত হচ্ছে অসংখ্য সংগঠন। তারা সেবার নামে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে লাখ লাখ মানুষের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা নিচ্ছে। তাই বিষয়টি জনগুরুত্ব বিধায় মাননীয় বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সবিনয় আবেদন করছি, এসব সংগঠনের আইনগত অবস্থান কি তা খতিয়ে দেখার জন্য।

আলাউদ্দিন আবু
মিরপুর-১১, ঢাকা

ফলের ফল কাঁচকলা

দেশের খেলাধুলার মান ক্রমশ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? আর কোথায় গেলে এই লাগামহীন ব্যর্থতার কিছুটা অবসান ঘটবে? কি নেই বাংলাদেশে ক্রিকেট টিমের সুযোগ-সুবিধা, সরঞ্জাম, অর্থ, লোকবল, যা উন্নত দেশের ক্রিকেটার বা দল পেয়ে থাকে তার। সবই তো আমাদের আছে। তবু কেন বার বার এই মহামারী আকারে খেলোয়াড়দের প্যাভিলিয়নে ফিরে আসতে দেখা যায়? আমরা যারা ক্রিকেট ভালোবাসি তারা চাইনি যে রাতারাতি আমাদের জয় এনে দাও। চাই কেবল ভালো খেলার এক ধারাবাহিকতা। কিন্তু আজ পর্যন্ত আইসিসির পর মনে পড়ে না বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম ভালো খেলেছে বা খেলছে। নির্বাচকমন্ডলী বারবার এই কথা বলে আসছে, বয়স্ক বা প্রধান খেলোয়াড় দলে নিলে তারা বেশি দিন সার্ভিস দিতে পারবে আর তাই প্রবীণদের দূরে ফেলে নবীনদের নিয়ে লাফালাফি 'ফলের ফল কাঁচকলা'
আমি বুঝি না ক্রিকেট বোর্ড কেন যে নির্বাচকদের পরিবর্তন করছে না। তবে কি রাজনীতি? স্বজনপ্রীতি? আমি যদ্দুর জানি, ব্যক্তিগত পারফর্মেন্স যার ভালো তাদের ওপর নির্ভর করা যায়। আর সেই দৃষ্টিকোনো থেকে আকরাম, বুলবুল, নান্নু ছিলেন আছেন- বর্তমান দলের প্রধান নির্বাচন ফারুক সাহেব নবীনের নামে প্রতিবার খেলোয়াড় বদল করে চলেছেন। ভাবতে কষ্ট হয় এই ভেবে যে প্রবীণ বলে এই তিন সাবেক ক্রিকেটারকে দলে নেওয়া হয়নি। কিন্তু দলের পরিচর্যা ও দেখাশোনার জন্য তো ডাকতে পারতেন। প্রতিবার দলের ব্যর্থতা খুঁজতে খেলোয়াড়দের বলির পাঁঠা বানিয়ে দল থেকে বাদ দেয়া হয়। কিন্তু ফল যা তা বলে লাভ নেই। একবারও দেখা যায়নি দলের ম্যানেজমেন্ট পরিবর্তন হয়েছে। অথচ উন্নত দেশে ব্যর্থতার ম্যানেজমেন্টকেও বদল করা হয়।

রহমান শেখ
ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ

ব্যাংকে পরিচয়দানকারীর হয়রানি

আমাদের দেশে ব্যাংকের গ্রাহক কর্তৃক সংঘটিত কোনো জালিয়াতি-অনিয়মের জন্য ওই গ্রাহকের পরিচয়দানকারীকে আইনের মুখোমুখি হতে হয়, হয় জেল-জরিমানা। অনিয়ম-জালিয়াতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা না থাকা সত্ত্বেও কিংবা কোনোরকম সুবিধাভোগী না হয়েও পরিস্থিতির শিকার হতে হয় পরিচয়দানকারীকে। ব্যাংক ছাড়া জবাবদিহিতার এমন আজব বিধি-বিধান অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে আছে বলে আমাদের জানা নেই। কতগুলো উদারণ দোয়া হল: ১. পুলিশের প্রত্যয়নপত্রের (Verifieation Report) ভিত্তিতেই কোনো নাগরিককে পাসপোর্ট প্রদান করা হয়। এই পাসপোর্টধারী ব্যক্তি ভ্রমণ, ওমরাহ, হজ, ব্যবসা, শিক্ষা কিংবা চিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের ভিসা নিয়ে বিদেশ যান। ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও কেউ কেউ বিদেশে থেকে যায়। অবৈধভাবে অবস্থানের দায়ে আবার দেশে ফেরত আসেন। ভেরিফিকেশন রিপোর্ট প্রদানকারী পুলিশ কিংবা পাসপোর্ট ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে কোনো জবাবদিহি করতে হয় না। ২. সরকারি চাকরিতেও পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট অনুসারে নিয়োগ করা হয় বা হয় না। দেখা গেছে, নৈতিক পদস্খলন ধরনের অপরাধে চাকরিচ্যুত হলেও রিপোর্ট প্রদানকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা হয় না। ৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত প্রশংসাপত্র কিংবা ইউপি চেয়ারম্যান/ ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদপত্রে মুদ্রিত থাকে 'তার স্বভাব চরিত্র ভালো, 'রাষ্ট্র ও আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকান্ডে জড়িত নহেন, তিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী'- ধরনের বাক্য। এই সনদপত্র, প্রশংসাপত্রধারীর কোনো নেতিবাচক কর্মকান্ড, অপরাধের দায় সনদপত্র প্রদানকারীর ওপর বর্তায় না। ৪. বিআরটিএ যথাযথ পরীক্ষার ভিত্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু করে থাকে। ড্রাইভাররা ওই লাইসেন্স গলায় ঝুলিয়েই আইন অমান্য করছে; দুর্ঘটনায় মানুষ মরছে। এ ব্যাপারে ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ কোনো জবাবদিহিতার মুখোমুখি হয় না। ব্যাংকের কোনো ফরমেই 'গ্রাহকের কোনোরূপ জালিয়াতির জন্য তার পরিচয়দানকারী দায়ী থাকবেন' মুদ্রিত নেই। এটি উল্লেখ থাকলে পরিচয়দানকারীকে গ্রাহকের কৃতকর্মের জন্য আইনের আওতায় আনলে কোনো কথা থাকত না। সে ক্ষেত্রে পরিচয়দানকারীর দায় থাকবে। পরিচয়দানকারী হতে কোনো ব্যক্তি ভালোভাবে চিন্তা করে দেখবেন। আমাদের মনে হয় ১৯৩৮ সালে প্রণীত পরিচয়দান বিষয়ক আইনকে সময়োপযোগী করে নিলে গ্রাহক সাধারণ অহেতুক হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হবেন না। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ভেবে দেখবেন কি?

আবদুল মকিম চৌধুরী, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭

মেয়েদেরই রুখে দাঁড়াতে হবে

একুশে আগস্টের ভয়াবহ চিত্র কল্পনা করে মনে পড়ল ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এর কথা। যারা এসব করছেন তারা কেন এসব করছেন একবারও কি ভাবেন তারা? বাংলাদেশের যুক্তরাষ্ট্রের মত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শত্রুও থাকার কথা নয় এমন। দেশে সাম্প্রতিক বোমা ও গ্রেনেড হামলার দিকে তাকালে মনে হয় বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও মুক্তচিন্তার বাহকরাই তাদের লক্ষ্য। কিন্তু বাংলাদেশ তো সৌদি আরবের রাজতন্ত্র নয় যে ইচ্ছে করলেই বোমা ও গ্রেনেড মেরে এদেশের ধমনীতে প্রবাহিত হাজার বছরের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বাউল ও পয়লা বৈশাখ মুছে ফেলা যাবে। কাজেই যারা এসব করছেন তারা বৃথাই চেষ্টা করছেন ও অগণিত নিষ্পাপ জনসাধারণের জীবন হরণ করে নিষ্ঠুর খুনির খাতায় নাম লেখাচ্ছেন। দোহাই, আপনারা বাংলাদেশকে আরেক আফগানিস্তান বানানোর চেষ্টা করবেন না। দেশের প্রগতিশীল নারী সমাজসহ সমস্ত নারী সমাজেরও এ ব্যাপারে অনেক দায়িত্ব রয়েছে। আপনারা দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাতা, বধূ। তাই বেশি করে আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে অবহিত হন। পড়ুন ইরান, সৌদি আরবের নারীদের জীবনযাত্রা। দেশের মানুষের সামনে আজ বিরাট চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে টিকে থাকতে হলে চাই আধুনিক জ্ঞানী, দক্ষ একবিংশ শতাব্দীর গ্লোবাল ভিলেজের নেতৃত্ব দেয়ার মতো ব্যক্তিত্ব। স্বপ্নের নেতাদের নির্বাচিত করুন যারা আপনাদের নিরাপদ, সুখী, বৈষম্যহীন এক সমতাময় জীবনের দিকে নিয়ে যাবে।

লাইজু মান নাহার, The Netherlands, L.nagar@hetnet.nl

টেলিফোন স্থানান্তর ফি

ডিজিটাল টেলিফোন সংযোগ ফি ১৮ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে স্থানভেদে ১০, ৮ ও ৫ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্তটি ছিল যুগান্তকারী। এর ফলে টেলিফোন সংযোগের পরিমাণ অনেক বেড়েছে। আবার টেলিফোন কলচার্জ কমানোর এবং টেলিফোন ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি দুষ্টক্ষত রয়ে গেছে। তা হলো টেলিফোন স্থানান্তর ফি আগের মতো আড়াই হাজার টাকা রয়ে গেছে, যা অবিশ্বাস্য! কেউ শখ করে নিজের টেলিফোন স্থানান্তর করে না। যেখানে উপজেলা পর্যায়ে টেলিফোন সংযোগের জন্যে ৫ হাজার টাকা লাগে সেখানে তা স্থানান্তরের ফি আড়াই হাজার টাকা একেবারেই অযৌক্তিক। এত বেশি হারে স্থানান্তর ফি'র কারণে বাধ্য হয়ে অসৎপথে যাচ্ছে মানুষ। লাইনম্যানদের সঙ্গে যোগাসাজশ করে ৫শ' টাকায় টেলিফোন স্থানান্তর করা হচ্ছে। যিনি বৈধভাবে টেলিফোন সংযোগ নিয়েছেন প্রয়োজনে তার টেলিফোন স্থানান্তর এমনিতেই করে দেওয়া উচিত। সেখানে প্রতীক হিসেবে ৫শ' টাকা নিলে আমাদের কিছু বলার থাকে না। আমরা অবিলম্বে টেলিফোন স্থানান্তর ফি আড়াই হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ৫ শ' টাকা করার জোর দাবি জানাচ্ছি।

আখতারুল আলম বাবলু
লোহাগড়া, নড়াইল